বঙ্গদেশের প্রাচীন বৈষ্ণব তীর্থ

রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

তোমায় হৃদ-মাঝারে রাখব, ছেড়ে দেব না,
ছেড়ে দিলে সোনার গৌর, আর তো পাব না।

শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলনের অভিঘাতে বঙ্গদেশে নানাস্থানে গড়ে ওঠে বৈষ্ণব শ্রীপাট, আখড়া, সমাজ। বৈষ্ণবধর্ম সাধন, বৈষ্ণব দর্শন চর্চা ও নাম-সংকীর্তনে মুখরিত হয়ে ওঠে এই স্থানগুলি তথা সমগ্র বঙ্গদেশ। কালক্রমে এগুলি বৈষ্ণবদের পরম তীর্থে পরিণত হয়। এমন কয়েকটি প্রাচীন বৈষ্ণবতীর্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

কৃষ্ণপুর ঃ

১৫১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচল যাওয়ার পথে শান্তিপুর, কাটোয়া, কালনা হয়ে বন্দর সপ্তগ্রামের বণিকদের বসতিতে আসেন। তৎকালে, সপ্তগ্রামের এক অখ্যাত গ্রাম ছিল কৃষ্ণপুর। বর্তমানে, হুগলি স্টেশনের পশ্চিমে (২ কিমি দূরে) সরস্বতী নদীর তীরে (মগরা থানা) অবস্থিত।

বালক রঘুনাথ মজুমদার তৎকালীন হোসেন শাহের রাজস্ব আদায়কারী সপ্তগ্রামের জমিদার গোবর্দ্ধন ও হিরণ্যের পরিবারের সন্তান। তাঁরা বছরে রাজস্ব বাবদ বারো লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা জমা দিয়েও আট লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা আয় করতেন। তাঁদেরই একমাত্র পুত্র রঘুনাথ সংসার ত্যাগ করে শ্রীচৈতন্যের সহচর হয়ে নীলাচল যাবার বাসনা করেন। মহাপ্রভু তাঁকে ফিরিয়ে দেন। শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রভু নীলাচল থেকে ফিরে বৃন্দাবন যাবেন এই খবর পেয়ে রঘুনাথ পুনরায় শান্তিপুরে শ্রীচৈতন্যের সাথে দেখা করেন এবং সহচর হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তখন প্রভু শ্রীচৈতন্য সর্বসাধারণ ভক্তদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য রঘুনাথকে কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দেন—

"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভব-সিন্ধু কূল।।
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথা-যোগ্য বিষয় 'ভুঞ্জ' অনাসক্ত হঞা।।
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার।।
বৃন্দাবন দেখি যবে আসিব নীলাচলে।
তবে তুমি আমা-পাশ আসিহ কোন ছলে।।

সে-ছল সে-কালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণ কৃপা যাঁরে, তারে কে রাখিতে পারে।।

নিত্যানন্দ প্রভু পানিহাটিতে (দঃ ২৪ পরগণা) শ্রীচৈতন্যের নীলাচলের সহচর রাঘব পন্ডিতের গৃহে (রাঘব ভবন) অবস্থান করছিলেন। রঘুনাথ নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা পাওয়ার জন্য পানিহাটি বা পেনেটি যান। নিত্যানন্দ প্রভু সংবাদ পেয়ে পরম বৈষ্ণব রঘুনাথকে সমস্ত ভক্তদের চিড়া, দহি ভক্ষণ করানোর আদেশ দেন। সেই থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার আগের ত্রয়োদশী তিথিতে পানিহাটি (খড়দহ থানা) গঙ্গার তীরে রাঘব পন্ডিতের রাঘব ভবনে 'দন্ড মহোৎসব' বা চিড়া-দধির মহোৎসব ও মেলা পালিত হয়।

সপ্তগ্রামে রঘুনাথ (মজুমদার) গোস্বামীর ফিরে আসায় বাবা ও ও জ্যেঠা একমাত্র সন্তানকে ফিরে পেয়ে সকল গ্রামবাসীকে মাছ ও ভাতের নিমন্ত্রণ করেন। মগরায় সেই উৎসব আজও চলছে। সপ্তগ্রামের জমিদার-নন্দন রঘুনাথ দাস গোস্বামী স্থাপন করলেন প্রেম-প্রতিমা শ্রীকৃষ্ণকে। পরবর্তীকালে, ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে তৈরী হয় মন্দির। আটচালা মন্দিরের কারুকার্য অপূর্ব সুন্দর। বিগ্রহ নাই। বৈষ্ণব শিরোমণি রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জন্মভিটা ও শ্রীপাট এই কৃষ্ণপুর। ১লা মাঘ উত্তরায়ণ মেলা হয়। সরস্বতী নদীর তীরে এই শ্রীপাট আজও অতীত দিনের স্মৃতি বহন করে চলেছে। এই শ্রীপাটের পিছনেই সরস্বতী নদীর তীরে মাছের মেলা হয়।

নিত্যানন্দপুর ঃ

মগরা থানার কুন্তীঘাট স্টেশনের পাশেই সপ্তগ্রামের একটি গ্রাম নিত্যানন্দপুর। দ্বাপরের সুবাহু নামা পঞ্চম গোপাল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট (জন্ম বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার উদ্ধারণপুর গ্রামে)। নিত্যানন্দ প্রভুর লীলাক্ষেত্র ও পূণ্যতীর্থ এই নিত্যানন্দপুর।

নিত্যানন্দ প্রভুর ডাল রাঁধার কাঁটা থেকে সৃষ্ট ভগবৎ লীলার সার্থক সৃষ্টি "মাধবীলতা গাছ ও নূপুর কুন্ড সমন্বিত" এই শ্রীপাট। অবিভক্ত বাংলার অত্যাচারিত দুর্দশাগ্রস্ত মানুষজনকে বুকে টেনে নিয়ে প্রেমবন্যা উজাড় করে দেন। অচ্ছুৎ, অসহায় ও অত্যাচারিত মানুষগুলি নাগপাশ থেকে মুক্তি পায়। শ্রীচৈতন্যের নীলাচলের সহচর নিত্যানন্দ প্রভু কালনা হয়ে এই সপ্তগ্রামের নিত্যানন্দপুরে শ্রীচৈতন্য সহ (১৫১০ খ্রি.) আসেন।

মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উৎসব এবং ১লা মাঘ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষ্যে মেলা হয়।

বাথনা (ফুলিয়া) ঃ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নীলাচলের সহচর ভক্ত হরিদাস ঠাকুরের সাধনপীঠ ও মন্দির শান্তিপুরের ৪ কিমি দূরে বাথনা স্টেশনের উত্তরে কদমপুরে। ভাগীরথীর তীরে বয়ড়া গ্রামে কৃত্তিবাস ওঝার বাস্তু ভিটা। সমগ্র অঞ্চলটিকে ফুলিয়া বলে। অদ্বৈত সীতানাথ

আচার্য ভক্তদের নিয়ে কৃত্তিবাসের জন্মভিটায় ভক্ত হরিদাসের সাথে চারণদল নিয়ে ধর্ম পরিভ্রমণে যেতেন। অদ্বৈত আচার্য যবন হরিদাসকে ফুলিয়ায় আশ্রয় দেন এবং তাঁরই উপদেশে হরিদাস নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের সাথে দেখা করেন।

হরিদাস ঠাকুর অত্যন্ত যন্ত্রণা পেয়েও হরি ভজন ছেড়ে দেন নি। তিনি কাজি ও বহু বিরোধীজনের নিকটে চিৎকার করে বলেছিলেন—

খন্ড খন্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।।

বর্তমানে, পোড়ামাটির শিল্প এবং একটি পুরানো কুয়া আছে।

তাঁর জন্মভিটা কলারোয়ার কেঁড়াগাছি গ্রামে। এটি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলায় সোনাই নদীর তীরে অবস্থিত। জন্ম ভিটায় আশ্রম আছে। উত্তর-২৪ পরগণার হাকিমপুরে সোনাই নদীর অপর তীরে এর অবস্থিতি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু ও ভক্ত হরিদাসকে আদেশ করেন—

শোন, শোন, নিত্যানন্দ, শোন হরিদাস।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ।।
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।।

হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব হয় আশ্বিন মাসে কদমপুর (ফুলিয়া) গ্রামে।

অম্বিকা কালনা (বর্ধমান) ঃ

শ্রীচৈতন্য প্রভু বৈষ্ণব পন্ডিত সূর্যদাসের সাথে দেখা করতে আসেন কালনার কুলতলা পল্লীতে ১৫১০ খ্রি. নীলাচল যাত্রাপথে। এক তেঁতুল গাছের তলায় সাক্ষাৎ হয়। সেই প্রাচীন গাছটি এখনও বিদ্যমান। বর্তমানে নিতাই, গৌর ও শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ আছে। তেঁতুল গাছের নীচে শ্রীচৈতন্য প্রভুর পদচিহ্ন একটি পাথরে খোদিত আছে। একটি মন্দিরে শ্রীচৈতন্য প্রভুর দারু মূর্তি আছে। বর্তমানে, আশ্রমটি গৌরীদাস পন্ডিতের আশ্রম নামে খ্যাত। এটি নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহস্থল হিসাবে দর্শনীয় স্থান। ১৩৫০-১৪০০ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত মদনগোপাল জিউর মন্দির আছে। এটি বুড়ো-বুড়ির দোলবাড়ি নামে খ্যাত।

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নৌকা যোগে দক্ষিণেশ্বর থেকে বৈষ্ণব ধর্মের শিরোমণি ভগবানদাস বাবাজীর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। দুই সিদ্ধ পুরুষের মহামিলন স্থলটি 'ব্রহ্ম মন্দির' নামে খ্যাত।

বাঘনাপাড়া ঃ

কালনা থেকে ৪ কিমি দূরে অবস্থিত। বলরাম, কৃষ্ণ ও বিখ্যাত গোপেশ্বর শিবমন্দির আছে এখানে। কবিরাজ রামচন্দ্র গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব সারস্বতকেন্দ্রও প্রতিটি বৈষ্ণবের

অবশ্য দর্শনীয়। শ্রীচৈতন্যের প্রকটকালের পূর্বেই এই স্থান বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র ছিল।

কুলীনগ্রাম ঃ

হুগলি জেলার ধনেখালি থানার অন্তর্গত। জৌগ্রাম স্টেশন থেকে বা মসাগ্রাম স্টেশন থেকে ট্রেকারে যাওয়া যায়। কবি মালাধর বসুর জন্মস্থান। কবি মালাধর বসু সুলতান রুকনউদ্দীন বারবাক শাহ (১৪৫৯-৭৪ খ্রি.)-র সময় শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যগ্রন্থ রচনা শুরু করেন (১৪৭৩-১৪৮০ খ্রি.)। গ্রন্থ রচনা শেষ হয় বারবাক শাহের পুত্র ইউসুফ শাহের আমলে। সুলতান তাঁকে গুণরাজ খাঁ নামে ভূষিত করেন। এখানে শ্রীচৈতন্যের নীলাচলের সহচর রামানন্দ বসুর পৈতৃক বসতবাটি। রামানন্দ বসু শ্রীচৈতন্যের সাত সম্প্রদায়ের চৌদ্দ মাদল দলে থেকে নীলাচলে কীর্তন করেন। ইঁটের তৈরী বৃহৎ মন্দিরে মদনগোপাল, শ্রীরাধিকা ও শ্রীললিতার বিগ্রহ আছে। মন্দিরের পূর্ব দিকে গোপাল দীঘি।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় মাহীনগরে মাহীপতি বসু কুলীনগ্রাম থেকে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। গ্রামের নাম দেন কুলীনগ্রাম। রামানন্দ বসু এখানে থাকতেন। শ্রীচৈতন্য প্রভু নীলাচলের পথে তিন দিন এখানে অবস্থান করেছিলেন।

কাটোয়া

আউরিয়া ঃ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-আশ্রম গুরু মহাত্মা কেশব ভারতীর বাস্তু ভিটা। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দের উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন নিমাই এখানে দীক্ষা নেন এবং গুরু শ্রীচৈতন্যের নাম দেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। মহাত্মা কেশব ভারতী আধ্যাত্মিক মার্গের সহজ পথ দেখান। এখানে, সন্ন্যাস গ্রহণের স্থান, শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ আছে। মহাত্মা কেশব ভারতীর সমাধি, গুরু ও শিষ্যের পায়ের ছাপ আজও বিদ্যমান। মহান বৈষ্ণব তীর্থ।

মাধবীতলা ঃ

একদা মাতাল, শ্রীচৈতন্যের পরম ভক্ত জগাই ও মাধাই ভ্রাতৃদ্বয়ের বসতবাটী। এখানেই নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুরকে দুই ভাই অপমান করে ছিলেন।

জাজিগ্রাম ঃ

কাটোয়া থেকে ২ কিমি দূরে অবস্থিত। পরম ভক্ত নিবাস আচার্যের শ্রীপাট। বিষ্ণুপ্রিয়া (প্রিয়াজি) তাঁকে দীক্ষা দেন। শ্রীনিবাস আচার্যের পৈতৃক বাসস্থান নদীয়ার চাকুন্দি গ্রামে। জাজিগ্রামে তাঁর মাতুলালয় ও শ্বশুরালয়। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির ও রাণী জাহ্নবীদেবী তাঁর শিষ্য ছিলেন। তাঁরা এখানে মন্দির ও একটি দীঘি খনন করে দেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ঐ মন্দির পরিত্যক্ত হলে, কাশিমবাজারের রাজা নতুন মন্দির তৈরী করিয়ে দেন। শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গতিগোবিন্দ মদনগোপাল বিগ্রহ ও

শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও নিত্য সেবা চলে। বৈষ্ণব সাধক বীরভদ্র গোস্বামী ও নরোত্তম ঠাকুরেরও আসন আছে।

বৈশাখী পূর্ণিমায় শ্রীনিবাস আচার্যের আবির্ভাব উৎসব হয়।

শ্রীখন্ড ঃ

শ্রীচৈতন্য পার্ষদ বৈষ্ণব অধিকর্তা নরহরি সরকার ঠাকুর ও তাঁর ভ্রাতা মুকুন্দ সরকারের শ্রীপাট। তাঁরা ছিলেন সুপন্ডিত ও ভক্তিরস শাস্ত্রজ্ঞ, শ্রীচৈতন্যের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত। উভয়েই শ্রীচৈতন্যের সাথে নীলাচল গিয়েছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যের সাত সম্প্রদায়ের চৌদ্দ মাদল কীর্তনের অংশীদার হয়েছিলেন। নরহরি সরকার ছিলেন গৌরনাগর বাদের প্রবর্তক।

গোপীনাথ, শ্যামরায়, মদনগোপাল, গোবিন্দজী ও মদনমোহন বিগ্রহ আছে। পৌষ মাসে তিরোভাব উৎসব হয়।

চৈতন্য পরবর্তী সময়ে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে অবলম্বন করে কীর্তন ঘরানা এখানেই সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এখানে কয়েক বার এসেছিলেন। বৈষ্ণব অধিকর্তা মুকুন্দ সরকারের পুত্র রঘুনন্দন সরকার ছিলেন অষ্ট রস সিদ্ধ বৈষ্ণব। তাঁরও আসন আছে।

খেতুরী ও বালুচর শ্রীগুরুপাট গম্ভীলা (জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ) ঃ

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে জিয়াগঞ্জে অবস্থিত এই শ্রীপাট। বৈষ্ণব পন্ডিত শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের বাস্তু ভিটা। বড় গোবিন্দের বাড়ি বা বড় ঠাকুরের বাড়ি নামে খ্যাত। শ্রীরাধা-গোবিন্দ জিউর মন্দির আছে। ফাল্গুনে দোল ও শ্রাবণে ঝুলন উৎসবে মহামেলা হয়।

মণিপুরের রাজা ভাগ্যচন্দ্র সিংহ (মেইডিংগু চিংথাম্বমবা) নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বৈষ্ণব ধর্মকে মনিপুরের রাজধর্ম বলে গ্রহণ করেন। ১৭৬৩-১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে শেষ বয়সে রাজ্যপাট ছেড়ে দিয়ে ভাগ্যচন্দ্র নবদ্বীপ ও গম্ভীলা শ্রীপাটে রাধা-গোবিন্দ আরাধনা করার উদ্দেশ্যে চলে আসেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ তাঁকে রাজর্ষি সম্মানে ভূষিত করেন। সেই সময় বাংলার মুসলমান রাজত্বে যখন বৈষ্ণবদের মূর্তিপূজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, গুহা খনন করে আড়ালে আবডালে মূর্তি অর্চনা করতে হত, তখন তিনিই প্রকাশ্যে মূর্তি পূজার পুনঃপ্রচলন ঘটান। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে এখানেই রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র দেহত্যাগ করেন। তাঁর সমাধিও এখানে আছে। ভাগ্যচন্দ্র ও তাঁর কন্যা বিম্ববতী মঞ্জুরী (শিজা লাই ওবি) ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে নবদ্বীপে "আনু মহাপ্রভু ও নবদ্বীপ চন্দ্রের" বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালীন নদীয়ার শাসক রাজা ঈশ্বরচন্দ্র (কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র) ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গের পূজার অনুমতি দেন।

১। মন্ত্রে প্রাপ্ত 'ভোজরাজা' সম্বন্ধে আপনি বলেছেন—একজন ঐতিহাসিক রাজা। কিন্তু তাই কি? মহাভারতের ভোজরাজা (কুন্তীভোজ) নয় তো? মন্ত্রে পুরাণের উল্লেখ এত বেশি যে 'ভোজ'-কে পৌরাণিক মনে করাই স্বাভাবিক।

২। মন্ত্রগুলির মধ্যে বৌদ্ধ ও বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব যা আপনি দেখিয়েছেন, তা অনস্বীকার্য। কিন্তু বুদ্ধদেবের নাম সরাসরি কোন একটি মন্ত্রেও নেই কেন? কৃষ্ণ, শিব, মনসা, চণ্ডী, খোদা—এত অসংখ্য বার এল—অথচ বৌদ্ধতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও মন্ত্রে সরাসরি 'বুদ্ধদেব' এলেন না কেন? 'জগন্নাথ'-কে বুদ্ধ বলেছেন। মানি সে যুক্তি। কিন্তু 'জগন্নাথ' আজ আর ঠিক 'বুদ্ধদেব' নন। শবর দেবতা হিসাবেই 'জগন্নাথ'কে দেখতে চেয়েছেন সাম্প্রতিক পণ্ডিতেরা।

৩। ক্ষুদিরাম দাস মহাশয়ের নিবন্ধটি সংযোজনার কি কোন দরকার ছিল? তাও শেষের দিকে কেন? দাশগুপ্ত মহাশয়ের আলোচনাটাই তো ভূমিকা হিসাবে যথেষ্ট ছিল।

আপনি কর্মজীবন থেকে সহজে অবসর নিন এবং দীর্ঘায়ু হোন, শতায়ু হোন, ঈশ্বরের কাছে এই কামনা করি। আপনাকে আরও লিখতে হবে। আমরা সেই সব গ্রন্থ পাঠ করার জন্য অপেক্ষা করে রইলাম। কোন অভিমান কোন ক্ষোভ নয়—আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা যেন আপনাকে প্রেরণা দেয়।

আমার ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানবেন। ইতি—

রবি সামন্ত

৯/১২/৮২

সম্পাদকের সংযোজন ঃ

১। ডঃ নমিতা মন্ডলের 'মল্লভূমের মন্ত্রযান' বইটি ১৩৮৮ সালে বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত হয়।

২। মন্ত্র বিষয়ে ডঃ রবীন্দ্রনাথ সামন্তের (সহলেখক- সুশান্ত কবিরাজ) বই 'সাপের মন্ত্র ও ঝাড়ফুঁক' ১৪০৯ সালের ২৫শে বৈশাখ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক—সাধারণ সম্পাদক, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, ৬০ জেমস লঙ সরণি, বেহালা, কলকাতা-৩৪। বইটি সম্পর্কে আমার একটি আলোচনা 'স্মরণে ও মননে রবীন্দ্রনাথ (রূপাই) সামন্ত' বইতে সংকলিত হয়েছে।

৩। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'ভারতকোষ প্রথম খন্ড'-এর ৫১৭ পাতায় 'ইন্দ্রজাল' অংশ থেকে জানা যায় যে, মালব দেশের রাজা ভোজ ও তাঁর কন্যা (বিক্রমাদিত্যের মহিষী) রাণী ভানুমতী জাদুবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাঁদের নামানুসারে 'ভোজবাজি' ও 'ভানুমতী কা খেল' শব্দবন্ধের উৎপত্তি।